প্রাচীন বাংলার পথঘাট

শ্রী নীহাররঞ্জন রায়

যাতায়াত ও বাণিজ্যপথ

সাধারণভাবে এবং সংক্ষিপ্ত উপায়ে দেশ- পরিচয় লিখিতে বসিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বা নগর হইতে নগরান্তরে যাতায়তের পথের উল্লেখ করিয়া লাভ নাই। যেসব গ্রামের উল্লেখ প্রাচীন বাংলার লিপিগুলিতে পাওয়া যায় সেগুলি একটু বিশ্লেষণ করিলে প্রায়ই দেখা যায়, গ্রামের প্রান্তসীমায় রাজপথের উল্লেখ; অনেক সময় সে পথগুলিই এক বা একাধিক দিকে গ্রামসীমা অথবা কোনও ভূমিসীমা নির্দেশ করে, এবং সেই হিসাবেই পথগুলির উল্লেখ। অনুমান করিতে বাধা নাই, এই পথগুলিই গ্রাম হইতে গ্রামে ও নগরে বিস্তৃত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, দামোদরদেবের চট্টগ্রাম লিপিতে কামনাপিণ্ডিয়া গ্রামের ডাম্বারডাম পল্লীর একখণ্ড ভূমির পূর্বদিকে এক রাজপথের উল্লেখ আছে। কিছুদিন আগে ধনোরার অদূরে দুইটি বাঁধানো রাজপথের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। জঙ্গল কাটিয়া অথবা মাটি ভরাট করিয়া নতুন নতুন গ্রাম ও নগর পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরণের যাতায়াত - পথ ক্রমশ বিস্তৃত হইয়াছে। এইরূপ অনুমান করা চলে। এইসব সাধারণ স্থলপথ ছাড়া নদীমাতৃক দেশের অসংখ্য নদ-নদী, খাট - খাটিকা, খাল - বিল, যানিকা - স্রোতিকা ইত্যাদি বাহিয়া জলপথ তো ছিলই। উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গে যত লিপি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই এইসব জলস্রোতের উল্লেখ সুপ্রচুর; এবং ইহাদের প্রেক্ষাপটে যখন সঙ্গে সঙ্গে লিপিগুলিতে দেখা যায়, এবং সমসাময়িক ও প্রাচীনতর সাহিত্যে পড়া যায় নৌসাধনোদ্যত সমুদ্রাশ্রয়ী বাঙালীর কথা, তাহাদের অসংখ্য নৌবাট, নৌবিতান, নৌদণ্ডক, নাবাতক্ষেপণী প্রভৃতির কথা, গূঢ়, অধ্যাত্ম - সংগীতে (যেমন চর্যাপদে) নদনদী, নৌকা, নৌকার নানা উপাদান (যথা, দাঁড় হাল, মাস্তুল, পাল, লগি, নোঙরের কাছি) ইত্যাদির উপমা, তখন সহজেই মনের মধ্যে এই ধারণা জন্মায় যে, জলপথে নৌকাযোগে যাতায়াতই ছিল স্থলপথে যাতায়াত অপেক্ষা প্রশস্ততর। লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, এই নৌকা - যাতায়াত পূর্ব-বঙ্গে, পুন্ড্রবর্ধনে এবং সমতটে, অর্থাৎ নদ - নদীবহুল নিম্নশায়ী দেশগুলিতেই বেশি ছিল।

এইসব সাধারণ যাতায়াত - পথ ছাড়া দেশের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্যন্ত এবং দেশেরও সীমা অতিক্রম করিয়া দেশান্তরে যে-সব স্থল ও জলপথ বিস্তৃত ছিল, সে-সব পথ বাহিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী অসংখ্য নরনারী তীর্থযাত্রা, দেশভ্রমণ, ও বিচিত্রকর্ম উপলক্ষে— সর্বোপরি শ্রেষ্ঠী বণিক ও সার্থবাহের দল ব্যবসা - বাণিজ্য উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন গ্রামে, নগরে, তীর্থে এবং বাণিজ্যকেন্দ্রে, দেশান্তরের নগরে - বন্দরে যাতায়াত করিত, দেশ - পরিচয় প্রসঙ্গে সেই সব সুদীর্ঘ সুপ্রশস্ত বহুজন পদলাঞ্ছিত পথগুলির বিবরণই উল্লেখযোগ্য। এইসব পথ দেশের শুধু যাতায়াত পথ নয়, বাণিজ্যপথও বটে এবং এইসব পথ বাহিয়াই বাংলাদশে লক্ষ্মীর আনাগোনা। এইসব বিভিন্ন পথই, বর্তমান রেলপথগুলির পূর্ব পর্যন্ত, শুধু লক্ষ্মীর নয়, সরস্বতীরও আনাগোনার পথ ছিল ; রেলপথগুলি সাধারণ সেইসব সুপ্রাচীন পথ বাহিয়াই প্রতিষ্ঠিত। জীবনধারণের প্রয়োজনে, জীবনবিকাশের প্রেরণার মানুষ সুপ্রাচীনকালে দুর্গম বনজঙ্গল কাটিয়া, পাহাড় ভাঙিয়া, নদী ডিঙাইয়া, যে-সব পথের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে সে-সব পথ একদিনে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় না। মানুষের ব্যবহারের মধ্যে, তাহার স্মৃতি ও সংস্কারের মধ্যে, নতুন পথের মধ্যে সেইসব প্রাচীন পথ বাঁচিয়া তাকে। পৃথিবীতে সর্বত্রই তাহা ঘটিযাছে। বাংলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। নদ-নদী প্রবাহ সুপ্রাচীনকালে জলপথ নির্ণয় করিত, এখনও করে; নদীর খাত যখন বদলায় সঙ্গে সঙ্গে পথও বদলায়; খাত মরিয়া গেলে নতুন খাতে জলপ্রবাহ ছুটিয়া চলে, জলপথেও তাহার অনুসরণ করে। সমুদ্রস্রোত ও বিভিন্ন ঋতুর বায়ুপ্রবাহ প্রাচীনকালে সমুদ্রপথ নির্ণয় করিত; বায়ু - জাহাজপর্বের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে ইহাই ছিল নিয়ম; বাংলাদেশেও তাহার ব্যত্যয় ঘটে নাই।

দুঃখের বিষয়, প্রাচীন বাংলার অন্তর্বাণিজ্যের স্থলপথের বিবরণ স্বল্প। লিপিগুলিতে, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণীতে এবং কিছু সমসাময়িক সাহিত্যে কয়েকটি মাত্র সুদীর্ঘ পথের ইঙ্গিত ধরিতে পারা যায়। বিদেশী পর্যটক ও ঐতিহাসিকেরা বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধেই কৌতুহলী ছিলেন এবং সেইসব বাণিজ্যপথের বিবরণই তাঁহারা যাহা কিছু রাখিয়া গিয়াছেন। তবু, ফাহিয়ান্ বা য়ুয়ান - চেয়াঙের মত পর্যটক যাহারা বাংলার একজন জনপদ হইতে অন্য জনপদে কিছু কিছু ঘোরাঘুরি করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহারা প্রসঙ্গত অন্তর্দেশের পথের ইঙ্গিতও কিছু রাখিয়া গিয়াছেন। ইৎসিঙের বিবরণে, সোমদেবের কথাসরিৎসাগরের মত গ্রন্থে, দুই - চারটি জাতকের গল্পে, লিপিমালায় দু-একটি আকস্মিক উল্লেখেও এই জাতীয় পথের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এইসব পথ শুধু অর্ন্তবঙ্গ পথ নয়; বরং এইসব পথ বাহিয়াই বাংলাদেশে প্রাচীনকালে সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের সঙ্গে সকলপ্রকার যোগরক্ষা করিত।

আন্তর্দেশিক স্থলপথ

সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে পুন্ড্রবর্ধন হইতে পাটলিপুত্র পর্যন্ত একটি সুবিস্তৃত পথের উল্লেখ আছে। ইৎসিঙ্ (সপ্তম শতকে তৃতীয় পাদের শেষাশেষি) তাম্রলিপ্তি হইতে বুদ্ধগয়া পর্যন্ত পশ্চিমাভিমুখী একটি পথের ইঙ্গিত দিতেছেন। হাজারিবাগ জেলার দুধপানি পাহাড়ের আনুমানিক অষ্টম শতকের একটি শিলালিপিতে অযোধ্যা হইতে তাম্রলিপ্তি পর্যন্ত একটি সুদীর্ঘ পথের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। য়ুয়ান চোয়াঙ্ (সপ্তম শতকের দ্বিতীয় পাদ) বারাণসী, বৈশালি, পাটলিপুত্র, বুদ্ধগয়া, রাজগৃহ, নালন্দা, অঙ্গ ও চম্পা প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন কজঙ্গলে। আমি অন্যত্র দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে কজঙ্গল দেশ আংশিকত বর্তমান উত্তর - রাঢ়, বাঁকুড়া - বীরভূমের উত্তর - পশ্চিম প্রান্তবর্তী অনুর্বর জঙ্গলময় প্রদেশ হইতে তিনি গিয়াছিলেন পুন্ড্রবর্ধনে (উত্তরবঙ্গ = বগুড়া -রাজশাহী-রংপুর-দিনাজপুর); পুন্ড্রবর্ধন হইতে পথে এক প্রশস্ত নদী পার হইয়া কামরূপ; কামরূপ হইতে সমতট (ত্রিপুরা, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চব্বিশ পরগণার নিম্নভূমি); সমতট হইতে তাম্রলিপ্তি (দক্ষিণ - পূর্ব মেদিনীপুর); তাম্রলিপ্ত হইতে কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জেলার কানসোনা); এবং কর্ণসুবর্ণ হইতে ওড্র, কঙ্গোদ, কলিঙ্গ। য়ুয়ান - চোয়াঙের বিবরণীতে তাহা হইলে মোটামুটি আন্তর্দেশিক পথগুলির একটু ইঙ্গিত পাইতেছি। কজঙ্গল বা উত্তর - রাঢ় অঞ্চল হইতে একটি পথ ছিল পুন্ড্রবর্ধন পর্যন্ত বিস্তৃত। চম্পা (বর্তমান ভাগলপুর জেলা হইতে তিনি আসিয়াছিলেন। কজঙ্গলে। ভাগলপুর হইতে বর্তমানে যে রেলপথ রাজমহল পাহাড়ের ভিতর দিযা নানা শাখা - প্রশাখায় দক্ষিণমুখী হইয়া চলিয়া গিয়াছে সিউড়ি - রানীগঞ্জ-বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর-পুরুলিয়ার দিকে, এই পথই ছিল য়ুয়ান্ - চোয়াঙের পথ। কজঙ্গল হইতে উত্তরমুখী হইয়া এই পথ ধরিয়াই য়ুয়ান্ - চোয়াঙ্ রাজমহল বা রাজমহলের কিছুটা দক্ষিণে গঙ্গা অতিক্রম করিযা পরে পূর্বমুখী হইয়া পুণ্ডবর্ধনে গিয়াছিলেন। এখন ই-আই - আর পথের বর্ধমান - রানীগঞ্জ - সিউড়ি হইতে রওয়ানা হইয়া লালগোলা ঘাটে গঙ্গা পার হইয়া বি-এ আর পথে উত্তরবঙ্গে যাওয়া যায়, এবং সেখান হইতে সোজা রেলপথ ধরিয়া কামরূপ। এই রেলপথও প্রাচীন রাজপথই অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু, কামরূপ হইতে সমতটের পথ এখন বর্তমানকালে আর খুব পরিষ্কার ধরিতে পারা যায় না, ধলেশ্বরী - যমুনা - পদ্মা এই পথকে এমনভাবে ভাঙিয়া বাঁকাইয়া দিয়াছে যে, তাহার রেখা কল্পনায় আনা হয়তো যায়, কিন্তু সুস্পষ্ট ধরিতে পারা কঠিন। য়ুয়ান - চোয়াঙ্ বোধ হয় স্থলপথে পদব্রজেই আসিয়াছিলেন, বিবরণী পাঠে এই কথাই মনে হয়; বর্তমান

ভূমি- নক্শা অনুযায়ী অন্তত দুইবার তাঁহার দুইটি সুপ্রশস্ত নদী, যমুনা ও পদ্মা অতিক্রম করা উচিৎ। কিন্তু তাহার উল্লেখ বিবরণীতে কিছু নাই। মনে হয়, যমুনা ও পদ্মা আজিকার কিংবা মধ্যযুগের মত প্রশস্ত অস্তিত্ব তখন ছিল না। অথচ, এই এখন এই দুটিই নদীই বি-এন -আর পথের গতি নির্ণয় করিতেছে। গৌহাটিতে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া একটি পথ বগুড়া - সান্তাহার - ঈশ্বরদী (পদ্মা) কলিকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত; আর একটি পথ জগন্নাথগঞ্জ (যমুনা) সিরাজগঞ্জ - ঈশ্বরদী (পদ্মা) হইয়া কলিকাতা। দুটি পথই বাঁকিয়া চুরিয়া নদনদী এড়াইয়া অতিক্রম করিয়া বিস্তৃত। যাহাই হউক, সমতট হইতে ভাগীরথী পার হইয়া তমলুকের পথে তো এখনও বি-এন - আর পথ সোজা চলিয়া গিয়াছে, এবং ভাগীরথী তীর হইতে উত্তরাভিমুখী মুর্শিদাবাদ (কর্ণসুবর্ণ ছাড়াইয়া ই-আই - আর পথের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা এখনও বিস্তৃত। মুর্শিদাবাদ হইতে ওড্র বা উড়িষ্যা পর্যন্তও ই- আই -আর ও বি-এন আর পথে প্রাচীন রাজপথের ইশারা সহজেই পাওয়া যায়। প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপথ এ-সব সুদীর্ঘ পথগুলির দ্বারা পরস্পরযুক্ত ছিল সেইসব পথের ইঙ্গিত য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণ হইতে পাওয়া গেল। এইসব পথ তিনি নিজে আবিষ্কার করেন নাই। তাঁহার বহু আগে হইতেই বহু যানের চক্রপেষণে, বহু পশু ও বহু মানবের পদতাড়নায় এইসব পথ প্রশস্ত হইয়াছিল, তাঁহার পরেও বহুকাল পর্যন্ত এইসব পথ ক্রমাগত ব্যবহৃত হইয়া আজিকের রেলপথে বিবর্তিত হইয়াছে। কোথাও রেলপথ প্রাচীনপথকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে, কোথাও প্রাচীনপথ রেলপথগুলির পাশাপাশি চলিয়াছে। বস্তুত, ভারতবর্ষের কোনো রেলপথই নূতন সৃষ্ট নবাবিষ্কৃত পথ নয় প্রত্যেকটিই প্রাচীন পথের নিশানা ধরিয়া চলিয়াছে।

বহির্দেশী স্থলপথ : পশ্চিমমুখী পথ

অন্তর্দেশের পথ ছাড়িয়া দেশ হইতে দেশান্তরের পথগুলির ইঙ্গিত এইবার ধরিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে। উল্লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে, বাংলাদেশ হইতে তিনটি প্রধান পথ পশ্চিম দিকে বিস্তৃত ছিল। একটি পুন্ড্রবর্ধন বা উত্তর - বঙ্গ হইতে মিথিলা বা উত্তর - বিহার ভেদ করিয়া (বর্তমান বি - এন্- ডব্লিউ - আর এই পথ অনুসরণ করিয়াছে) চম্পা (ভাগলপুর) হইয়া পাটলিপুত্রের ভিতর দিয়া বুদ্ধগয়া স্পর্শ করিয়া (অথবা, পাটনা - আরা হইয়া) বারাণসী - অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; সেখান হইতে একেবারে সিন্ধু - সৌরাষ্ট্র - গুজরাটের বন্দর পর্যন্ত। বিদ্যাপতির পুরুষপরীক্ষায় গৌড় হইতে গুজরাট পর্যন্ত বাণিজ্যপথের ইঙ্গিত আছে। য়ুয়ান্ - চোয়াঙের বিবরণী ও কথাসরিৎসাগরের গল্প হইতে এই পথের আভাস পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পথটিরও ইঙ্গিত পাওয়া যায় য়ুয়ান্ - চোয়াঙের বিবরণীতেই। এই পথটি তাম্রলিপ্তি হইতে উত্তরাভিমুখী হইয়া কর্ণসুবর্ণের ভিতর দিয়া রাজমহল - চম্পা স্পর্শ করিয়া পাটলিপুত্রের দিকে চলিয়া গিয়াছে। তৃতীয় পথটির আভাস পাওয়া যাইতেছে ইৎসিঙের বিবরণ এবং পূর্বোল্লিখিত হাজারীবাগ জেলার দুধপানি পাহাড়ের আনুমানিক অষ্ট শতকীয় লিপিটিতে। এই পথ তাম্রলিপ্তি হইতে সোজা উত্তর - পশ্চিমাভিমুখী হইয়া বুদ্ধগযার ভিতর দিয়া অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই তিনটি পথ আশ্রয় করিয়াই প্রাচীন বাংলাদেশ উত্তর - ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষা করিত; বাংলা ও উত্তর - ভারতের যে কোনও বর্তমান রেলপথের নক্শা খুলিলেই দেখা যাইবে এই রেলপথগুলি সেইসব প্রাচীন পথই অনুসরণ করিয়াছে।

উত্তর - পূর্বমুখী পথ : উত্তরব্রহ্ম - মণিপুর - কামরূপ - আফগানিস্থান পথ

বাংলার পূর্বদিকে কামরূপ রাজ্য, উত্তরে চীন ও তিব্বত। উত্তরবঙ্গ ও কামরূপের ভিতর দিয়া বাংলাদেশ এই উত্তরাশায়ী দেশ দুটির সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষা করিত। এই পথের বিবরণ পাওয়া যায় য়ুয়ান্ -চোয়াঙ্ এবং কিয়া - তানের ভ্রমণবৃত্তান্তে। চীন - রাজদূত চাঙ্ কিয়েনের প্রতিবেদনে, এবং বোধহয় মুহম্মদ ইব্ন্ বখতিয়ারের আসাম - তিব্বত অভিযান সংক্রান্ত সুবিখ্যাত শিলালিপিটিতে। তবকাই - ই নাসিরী গ্রন্থেও বোধ হয় কামরূপের ভিতর দিয়া তিব্বত পর্যন্ত বিস্তৃত এই পথের উল্লেখ আছে। এই সাক্ষ্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে পথটির আভাস স্পষ্ট হইতে পারে। পুন্ড্রবর্ধন হইতে কামরূপ এবং কামরূপ হইতে সমতট পর্যন্ত দুইটি সুদীর্ঘ পথ যে ছিল, য়ুয়ান্ - চোয়াঙের বিবরণী এবং সন্ধানে আর কোনো সন্দেহ রাখে না; ইতিপূর্বেই তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হইয়াছে। এই দুই পথ দিয়া প্রাচীন কামরূপ এবং সুবর্ণকুড্যকের সমৃদ্ধ ও সুচারু বস্ত্রশিল্প, অগুরু চন্দন, হাতি প্রভৃতি বাংলাদেশে আমদানি হইত, এবং বাংলার সামুদ্রিক বন্দর ও আন্তর্দেশিক বাণিজ্যকন্দ্রগুলি হইতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ও ভারতবর্ষের বাহিরে রপ্তানি হইত। কিন্তু কামরূপই পূর্বাভিমুখী এই পথের শেষসীমা নয়। য়ুয়ান্ - চোয়াঙের অন্তত সাতশত বৎসর আগে চাঙ্ - কিয়েন (Chang - Kien) নামে এক চৈনিক রাজদূতের প্রতিবেদনে দক্ষিণ - চীন হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর - ব্রহ্ম ও মণিপুরের ভিতর দিয়া কামরূপ হইয়া আফগানিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত এক সুদীর্ঘ প্রান্তাতিপ্রান্ত পথের ইঙ্গিত ধরিতে পারা যায়। চাঙ্ - কিয়েন (খ্রী পূ ১২৬) ব্যাকট্রিয়ার বাজারে দক্ষিণ চীনের য়ুন্নান এবং সজেচোয়ান প্রদেশে জাত রেশমী বস্ত্র এবং সূক্ষ্ম বংশ দেখিতে পাইয়া খোঁজ লইয়া জানিয়াছিলেন, এই সমস্ত দ্রব্য আসিত চীন হইতে আফগানিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর - ভারতবর্ষ জুড়িয়া লম্ববান সুদীর্ঘ পথ বাহিয়া, সার্থবাহদলের পশু ও শকটবাহিনী ভর্তি হইয়া। সজেচোয়ান হইতে কামরূপ পর্যন্ত এক পথের খবর য়ুয়ান্ - চোয়াঙ্ সপ্তম শতকেও শুনিয়াছিলেন কামরূপবাসীদের নিকট হইতে; কঠিন পার্বত্য পথ দুই মাসে অতিক্রম করিতে হইত, এখবরও য়ুয়ান্ - চোয়াঙ্ পাইয়াছিলেন। নবম শতাব্দীর গোড়ায় কিয়া - তান (৭৮৫ - ৮০৫ খ্রী) নামে আর একজন চীনা পরিব্রাজক টংকিন শহর হইতে কামরূপ পর্যন্ত একটি পথের খবর বলিতেছেন। কামরূপে আসিয়া এই পথটি চাঙ্ - কিয়েন বর্ণিত পথের সঙ্গে মিলিত হইত। এবং সেখান হইতে করতোয়া নদী পার হইয়া, পুন্ড্রবর্ধনের ভিতর দিযা, গঙ্গা পার হইয়া কজঙ্গল যাইত। এবং সেখান হইতে মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কজঙ্গল হইতে পুন্ড্রর্ধন হইয়া কামরূপের যে পথের কিয়াতান বলিতেছেন সেই পথই সপ্তশতকে য়ুয়ান্ - চোয়াঙের পথ ছিল।

চাঙ্ - কিয়েন্ বর্ণিত পথটির এবং অন্য আর একটি পথের আরও ইঙ্গিত অন্য দুইটি সাক্ষ্য হইতে পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয়। তবকাত্ -ই-নাসিরী গ্রন্থে বর্ণিত আছে, মুহম্মদ ইব্ন বখ্তিয়ার নদিয়া জয় ও ধ্বংস করিয়া, গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীতে নিজ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া তিব্বত জয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পথে তাঁহাকে একটি সুপ্রশস্ত খরস্রোত নদী (খরতোয়া = করতোয়া ?) পার হইতে হয়; সেই নদীর কূল ধরিয়া দশ দিনের পথের পর কুড়িটি পাষাণনির্মিত খিলানযুক্ত একটি সেতু পার হন। সেই সেতু পার হইয়া আরও ষোলো দিনের পথের পর একটি প্রাকার - বেষ্টিত দুর্গরক্ষিত নগর দেখিতে পান, এবং সংবাদ পান যে, সেখান হইতে পঁচিশ ক্রোশ দূরে করবত্তন, করপত্ন বা করমবতন নামে একটি জায়গায় পঞ্চাশ হাজার তুরস্ক (?) সৈন্য আছে; সেখানে বহু ব্রাহ্মণের বাস, এবং সেখানকার বাজারে প্রতিদিন সকালবেলা পনের শ' টাঙ্গন (টাট্টু ঘোড়া বিক্রয় হয়। লক্ষ্মণাবতীতে যে - সব ঘোড়া দেখিতে পাওয়া যায় সে-সমস্তই সেই বাজারের কেনা। ঐ দেশের পথ - ঘাট পার্বত্যদেশ ভেদ করিয়া বিলম্বিত। তিব্বত হইতে কামরূপ পর্যন্ত এই পার্বত্য পথে পঁয়ত্রিশটি গিরিবর্ত্ম আছে এবং সেইসব গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়াই লক্ষ্মণাবতী পর্যন্ত ঘোড়াগুলিকে আনা হয়। এই বিবরণ কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন। প্রাকারবেষ্ঠিত দুর্গরক্ষিত নগরটি কোন্ নগর তাহা নির্ণীত হয় নাই। করবত্তন, করপত্তন বা করমবতন কোন্ স্থান নির্দেশ করে, তাহাও বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন, করমবতনের ঘোড়ারহাট দিনাজপুর জেলার নেকদমারহাট; সেই হাটে নাকি এখনও বহু ঘোড়া বিক্রয় হয়, এবং সে-সব ঘোড়া তিব্বত - ভোটানের টাট্টুগোড়া। কিন্তু, করমবতনহাট দিনাজপুর জেলায় হওয়া একটু কঠিন। গৌড় হইতে দিনাজপুরজেলার যে কোনো স্থান ছাব্বিশ দিনের পথ হইতে পারে না। দশ সহস্র সৈন্য লইয়া হাঁটিলেও নয়। তাহা ছাড়া,

অন্য যুক্তিও আছে; মধ্যপথেই পর্যুদস্ত হইয়া নানাভাবে লাঞ্ছিত হইয়া তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। মিন্‌হাজ্‌ তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। মিন্‌হাজের বিবরণ সব বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও বখ্‌তিয়ার যে কামরূপের ভিতর দিয়া ব্যর্থ একটা উত্তরাভিযান চালাইয়াছিলেন তাহা বর্তমান গৌহাটির নিকটে ব্রহ্মপুত্রের তীরে কানাই বরশীবোয়া নামক স্থানে পাষাণগাত্রে খোদিত একটি শিলালিপিতেই সুপ্রমাণিত। এই লিপিটির পাথ এইরূপ :

শাকে ১১২৩৭ [১২০৬, ২৭ শে মার্চ, আনুমানিক]
শাকে তুরগ যুগ্মেশে মধুমাস ত্রয়োদশে।
কামরূপং সমাগত্য তুরস্কাঃক্ষয়মাযযুঃ।।

লিপিটির নিকটেই পাথরের খিলানযুক্ত একটি সেতু আছে। এই সেতুই কি মিন্‌হাজ-কথিত বত্রিশ খিলানাযুক্ত পাষাণ -সেতু? এই সেতুর পার হইয়া আরও ষোলা দিনের পথ হাঁটিয়া বখ্‌তিয়ার যেখানে পৌঁছিয়াছিলেন সেখান হইতে আরও পঁচিশ ক্রোশ দূরে করমবতনের হাট। কাজেই করমবতম দিনাজপুর জেলায় হইতেই পারে না। বরং মনে হয়, শিলালিপিও মিন্‌হাজ-কথিত সেতু, প্রকারবেষ্টিত দুর্গরক্ষিত নগর এবং করমবতনের হাট সমস্তই কামরূপসীমা হইতে তিব্বতের সুদুর্গম পার্বত্য পথে অবস্থিত ছিল। এই পথে অসংখ্য গিরিবর্ত্ম ছিল, এ খবর মিথ্যা না -ও হইতে পারে। যাই হউক, কামরূপ হইতে তিব্বত পর্যন্ত একটি দুর্গম গিরিপথ ছিল, এ-বিষয়ে সন্দেহের অবসর কম। কামরূপে আসিয়া এই পথ চাঙ্‌ - কিয়েন্‌ কথিত চীন - ভারত - আফগানিস্থান প্রান্তাতিপ্রান্ত সুদীর্ঘ পথের সঙ্গে মিলিত হইত। হইতে পারে, এই পথ দিয়াও বৌদ্ধ পণ্ডিত ও পরিব্রাজকেরা এবং তিব্বতীদূতেরা মগধ ও বঙ্গাদেশ হইতে তিব্বতে যাতায়াত করিতেন। গৌহাটি শহরের নিকট ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া সোজা পঁচিশ মাইল উত্তরে একটি জায়গায় এখনও বৈশাখী পূর্ণিমায় এক বিরাট মেলা বসে; সেই মেলায় বহু তিব্বতী ব্যবসায়ী কম্বল ভেড়া, ঘোড়া ইত্যাদি বিক্রয়ের জন্য লইয়া আসে।

উত্তরে তিব্বতগামী পথ

কিন্তু তিব্বতের সঙ্গে যোগাযোগের আর একটি পার্বত্যপথ বোধ হয় ছিল। এই পথ উত্তর - বঙ্গের জলপাইগুড়ি - দারজিলিং অঞ্চল হইতে সিকিম, ভোটান পার হইয়া হিমালয় গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়া, তিব্বতের ভিতর দিয়া চীনদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পেরিপ্লাস - গ্রন্থে (প্রথম শতক) বোধ হয় এই পথের একটু ইঙ্গিত আছে। খ্রীষ্টিয় প্রথম শতকে চীনদেশ হইতে যে রেশম ও রেশমজাত দ্রব্যাদি বঙ্গাদেশে আসিত তাহা পূর্বোক্ত কামরূপের পথ বা এই সদ্যোক্ত পথ বাহিয়া আসিত বলিয়াই তো মনে হয়। এখনও কালিম্পং বা গ্যাংটকের বাজারে যে - সব পার্বত্য টাট্টু ঘোড়া, কম্বল, কাঁচা হলুদ, কাঁচা সোনার অলংকার, নানা বর্ণের পাথর ইত্যাদি বিক্রয় হয় তাহা প্রায় সমস্তই আসে তিব্বত ও ভোটান হইতে, ঐ দেশীয় লোকেরাই তাহা লইয়া আসে।

কামরূপ হইতে তিব্বতের পথ বা জলপাইগুড়ি - দারজিলিং হইতে তিব্বতের পথ ইহার কোনোটাই এখন আর বহুল ব্যবহৃত নয়। পার্বত্যপ্রদেশের লোকেরাই শুধু এই পথ ব্যবহার করিয়া থাকে বঙ্গ ও আসামের সমভূমিতে আসিবার প্রয়োজনে—কম্বল, ঘোড়া, সোনা, পাথর ইত্যাদির বিনিময়ে লবণ, বিলাস - দ্রব্য ইত্যাদি কিনিবার জন্য। কামরূপ হইতে ইত্তর - পূর্ব আসাম ও মণিপুরের ভিতর দিয়া, উত্তর ব্রহ্মের ভিতর দিয়া, যে পথ দক্ষিণ - পূর্ব চীনে চলিয়া গিযাছে, যে - পথের কথা চাঙ্‌ - কিয়েন বলিয়াছেন সেই পথে লোক যাতায়াত বরাবরই কিছু কিছু ছিল; মধ্যযুগেও ছিল, এবং বর্তমান যুগেও আছে। আসামে ও বাংলায় গোপনে আফিম আমদানি তো এই পথেই হইয়া থাকে। কিন্তু গত ভারত - ব্রহ্ম - চীন - জাপান যুদ্ধের তাগাদায় এই পথ পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে।

ত্রিপুরা - মণিপুর পথ

বঙ্গাদেশ হইতে পূর্বাভিমুখী আর একটি স্থলপথের উল্লেখ করিতেই হয়। এ-পথটি পূর্ববাংলার ত্রিপুরু জেলার লালমাই - ময়নামতী (প্রাচীন পট্টিকেরা রাজ্য) অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া সুরমা ও কাছাড় উপত্যকার (বর্তমান, শ্রীহট্ট - শিলচর) ভিতর দিয়া, লুসাইপাহাড়ের উপর দিয়া, মণিপুরের ভিতর দিয়া, উত্তর - ব্রহ্মদেশ ভেদ করিয়া, মধ্য - ব্রহ্মদেশে পাগান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পট্টিকেরা রাজ্যের সঙ্গে একাদশ ও দ্বাদশ শতকে ব্রহ্মদেশের পাগান রাষ্ট্রের খুব ঘনিষ্ঠ বৈবাহিক ও রাজনৈতিক সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। এই দুই রাজ্যের সংযোগ ছিল এই সদ্যোক্ত পথে। এই পথের সংবাদও স্থানীয় লোক ছাড়া আর সকলেই ভুলিয়া গিয়াছিল, অথচ মধ্যযুগে মণিপুর - ব্রহ্মযুদ্ধের সৈন্য সামন্ত তো এই পথ দিয়াই যাওয়া - আসা করিয়াছে। চোরাই ব্যবসাও বরাবরই এই পথে চলিত। আজ প্রয়োজনের তাড়নায় সেই পথ আবার বহুজনের পদচারণে প্রশস্ত হইয়াছে।

চট্টগ্রাম - আরাকান পথ

আর একটি পথের প্রতি একান্ত সাম্প্রতিককালের দৃষ্টি পড়িয়াছে। এই পথ দক্ষিণশায়ী চট্টগ্রাম হইতে আরাকানের ভিতর দিয়া নিম্ন - ব্রহ্মের প্রোম বা প্রাচীন শ্রীক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত। আনুমানিক নব - একাদশ শতকে আরাকানে চন্দ্রবংশীয় রাজাদের আধিপত্য সুবিদিত। চট্টগ্রামের সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও সমান সুপরিচিত। মধ্যযুগে আরাকান মুসলমান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের প্রচুর সমৃদ্ধি দেখা গিয়াছিল; এই সাহিত্যের সঙ্গে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। আজ প্রয়োজনের তাড়নায় এই চট্টগ্রাম - আরাকান - প্রোম পথও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিযাছে। অবশ্য এই পথের সমান্তরালবাহী সমুদ্রকূলশায়ী জলপথ তো সঙ্গে সঙ্গে ছিলই।

তাম্প্রলিপ্তি হইতে দক্ষিণমুখী পথ

আর একটি স্থলপথের উল্লেখ করিলেই স্থলপথবৃত্তান্ত শেষ হইবে। এই পথটি তাম্রলিপ্তি - তমলুক হইতে, কর্ণসুবর্ণ হইতে, সোজা দক্ষিণবাহী হইয়া বাংলা - দেশকে দক্ষিণ - ভারতের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছে। য়ুয়ান্‌ - চোয়াঙ্‌ এই পথ ধরিযাই কর্ণসুবর্ণ হইতে ওড্র, কঙ্গোদ, কলিঙ্গ, দক্ষিণ - কোশল, অন্ধ্র হইয়া দ্রাবিড়, চোল, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে গিয়াছিলেন। পাল ও সেন রাজারা এই পথেই দক্ষিণ - দেশে আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পশ্চিম - চালুক্যবংশীয় বিক্রমাদিত্য, চোলরাজ রাজেন্দ্র চোল, এবং পূর্ব - গঙ্গাবংশের রাজারা এই পথেই বঙ্গাদেশ আক্রমণে সৈন্যচালনা করিয়াছিলেন। এই পথেই চৈতন্যদেব নীলাচল এবং দক্ষিণ - ভারতে গিয়াছিলেন। এই পথেই বর্তমান কালের বি - এন-আর এবং মান্দ্রাজ - রেলপথ বিস্তৃত।

অন্তর্দেশীয় নদীপথ

স্থলপথের কথা বলা হইল। এইবার আন্তর্দেশিক নদী বা সামুদ্রিক জলপথের কথা বলা যাইতে পারে। এ-সম্বন্ধে সর্বপ্রাচীন সাক্ষ্য কয়েকটি জাতক - কাহিনী হইতে পাওয়া যায়, শঙ্খ জাতক, সমুদ্দবাণিজ্য জাতক, মহাজনক জাতক ইত্যাদি গল্পে দেখা যায় মধ্যদেশের বণিকরা বারাণসী বা চম্পা হইতে জাহাজে করিয়া গঙ্গা - ভাগীরথি পথে তাম্প্রলিপ্তি আসিত এবং সেখান হইতে বঙ্গোপসাগরের কূল ধরিযা সিংহলে, অথবা উত্তাল সমুদ্র অতিক্রম করিযা যাইত সুবর্ণ ভূমিতে (নিম্ন - ব্রহ্মদেশ)। সুবর্ণভূমির পথে বহুদিন বণিকেরা কূলভূমির চিহ্ন পর্যন্ত দেখিতে পাইত না। মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে সম্ভবত স্ট্র্যাবো এই তথ্য আহরণ করিয়াছিলেন যে, ভাগীরথি

- গঙ্গায় উজান বাহিয়া সাগরমুখের বন্দর হইতে বাণিজ্যতরীগুলি প্রাচ্য ও গঙ্গরাষ্ট্রের তদানীন্তন রাজধানী পাটলিপুত্র পর্যন্ত যাওয়া আসা করিত। নদীপথে গঙ্গা - ভাগীরথী বাহিয়াই বঙ্গদেশের সঙ্গে উত্তর - ভারতের যোগাযোগ ছিল। এই তথ্য নিঃসন্দেহ, এবং জলপথে তাহাই তো একমাত্র পথ। এ-পথ প্রাগৈতিহাসিক পথ এবং রেলপথে দ্রুত বাণিজ্য - সম্ভার যাতায়াতের সূত্রপাতের আগে বাণিজ্যলক্ষ্মীর যাতায়াত এই পথেই ছিল বেশি। ঊনবিংশ শতকেও বাঙালি এই নৌকাপথে কাশীধামে যাওয়া আসা করিত, এই স্মৃতি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। প্রাচীন বাংলার অন্য দুইটি প্রধানতম নদনদী, করতোয়া এবং ব্রহ্মপুত্র বা লৌহিত্য - পথে বাণিজ্যলক্ষ্মীর যাতায়াতের সাক্ষ্য বড় একটা পাওয়া যায় না। তবে, কামরূপ হইতে কর্ণসুবর্ণ পর্যন্ত এক জলপথের ইঙ্গিত বোধ হয় পাওয়া যায় য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণীতে, হর্ষবর্ধন ভাস্করবর্মা - সংবাদ প্রসঙ্গে। কিন্তু, এই জলপথ কি ব্রহ্মপুত্র ভাটি এবং গঙ্গা উজান বাহিয়া, না কামরূপ হইতে স্থলপথে উত্তর - বঙ্গের ভিতর দিয়া তাহার পর কোশী বা মহানন্দার ভাটি বাহিয়া গঙ্গাতীরস্থ কর্ণসুবর্ণ পর্যন্ত, তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। যহা হউক, একথা অনুমান করিতে কিছুমাত্র কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় না যে, উত্তর - আসামের রেশমজাতীয় বস্ত্রসম্ভার, বাঁশ, কাঠ, চন্দনকাঠ, পান, গুবাক্ বা সুপারি, তেজপাতা ইত্যাদি ব্রহ্মপুত্র - সুরমা - মেঘনা বাহিয়াই বাংলাদেশে আসিত। বাঁশ, কাঠ, ঘর ছাইবার খড় ইত্যাদি তো এখনও ভাটির স্রোতে ভেলায় ভাসাইয়া বাংলাদেশে আনা হয়। পাট এবং ধান চাল তো আজও নৌকাপথেই আমদানি রপ্তানি হয় বেশি। বিশেষত পূর্ব - বাংলায় বিভিন্ন স্থানে এবং আসামে ও সুরমা উপত্যকা অঞ্চলে। করতোয়া (খরতোয়া?) যে এক সময় খুবই প্রশস্ত ও খরস্রোতা নদী ছিল এবং সোজা গিয়া সমুদ্রে পড়িত একথা তো আগেই বলিয়াছি। উত্তর - বঙ্গে যোগাযোগ এই নদীপথেই ছিল, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। একথাও আগে বলিয়াছি যে, এই নদীমাতৃক দেশে স্থলপথ অপেক্ষা নদীপথেই যাতায়াত ও বাণিজ্য প্রশস্ততর ছিল; লিপি এবং সমসাময়িক সাহিত্যেই যে শুধু সে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহাই নয়; মধ্যযুগের বাংলা - সাহিত্যে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি পর্যন্ত লোকের অভ্যাস ও সংস্কারের মধ্যেও তাহার আভাস ও ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

বহির্দেশী সমুদ্রপথ : বঙ্গ - সিংহল পথ

নদীপথে আন্তর্দেশিক বাণিজ্য অপেক্ষা প্রাচীন বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং বাণিজ্যপথের সাক্ষ্য প্রমাণ অনেক বেশি পাওয়া যায় জাতকের গল্পে তাম্রলিপ্তি হইথে সিংহল ও সুবর্ণ দ্বীপ যাতায়াত করা বলিয়াছি। দক্ষিণ - ভারত ও সিংহলের পথের কথাই আগে বলা যাক্। সিংহলী উতিগ্রন্থ দীপবংশ ও মহাবংশে উল্লিখিত লাঢ়দেশী রাজপুত্র বিজয়সিংহ কর্তক সমুদ্রপথে সিংহল গমন এবং দ্বীপটি অধিকার ইত্যাদি গল্পসাহিত্য বাঙালি কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কল্যাণে সুপরিচিত। কিন্তু এই লাঢদেশে কি প্রাচীন বাংলার রাঢ় জনপথ, না প্রাচীন সাক্ষ্য বিদ্যমান। পেরিপ্লাসের সাক্ষ্য আগে উল্লেখ করিয়াছি। এই গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বঙ্গদেশের সঙ্গে দক্ষিণ ভারত ও সিংহলের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য - সম্বন্ধ ছিল; সমুদ্রমুখে গঙ্গাবন্দর হইতে বাণিজ্যসম্ভার কোলম্ভিয়া (Colandia) নামক এক প্রকার জাহাজে বোঝাই হইত এবং সেই জাহাজগুলি দক্ষিণ - ভারতে ও সিংহলে যাতায়াত করিত। প্লিনিও এই সামুদ্রিক বাণিজ্যপথের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, আগে প্রাচ্যদেশ হইতে সিংহলে যাইতে কুড়ি দিন লাগিত, পরে (অর্থাৎ প্লিনির সময়ে এবং কিছু আগে) লাগিত মাত্র সাত দিন ('a seven days' sail according to the rate of spee of our ship')। চতুর্থ শতকে ফাহিয়ান্ তখন তাম্প্রলিপ্তি হইতে এক বাণিজ্য - জাহাজ চড়িয়া সিংহল যান তখন লাগিয়াছিল চৌদ্দ দিন ও রাত্রি। সিংহল তো খ্রীষ্ট পূর্বকাল হইতেই বৌদ্ধধর্মের এক বিশিষ্ট কেন্দ্র হইযা দাঁড়াইয়াছিল, এবং কালক্রমে এই হিসাবে এই দ্বীপটির খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা বাড়িয়াই চলিয়াছিল। ফাহিয়ানের পর হইতেই বহু চীন বৌদ্ধ পরিব্রাজক সিংহলে - বাংলাদেশে আসা - যাওয়া করিতেন এবং তাহা সদ্যোক্ত সমুদ্রপথেই। সপ্তম শতকে ইৎসিঙের বিবরণী পাঠে জানা যায়, ঐ সময় অসংখ্য চীনাদেসীয় বৌদ্ধ শ্রমণ সিংহল হইতে বাংলায় এবং বাংলা হইতে সিংহলে ঐ পথে যাতায়াত করিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই সূত্র ধরিয়াই মহাযান বৌদ্ধধর্ম এবং কিছু কিছু নাগরী লিপির বৌদ্ধধর্মগ্রন্থও সিংহলে প্রসারলাভ করিয়াছিল। অষ্টম শতকের পর বৈদেশিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হওয়ার পরে বহুদিন এই পথের কথা আর শোনা যায় না; তবে মধ্যযুগীয় বাংলা - সাহিত্য পাঠ করিলে মনে হয়, তখন এই পথ ধরিয়া অর্থাৎ সমুদ্রোপকূল বাহিয়া সিংহল হইয়া গুজরাত পর্যন্ত সমুদ্রপথ পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল, অথবা এই সব পথের সুপ্রাচীন স্মৃতি প্রচলিত গল্প - কাহিনীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, যেমন মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে। সিংহল হইতে মালয়, ন্নি - ব্রহম, সুবর্ণদ্বীপ, যবদ্বীপ, চম্পা, কম্বোজের সমুদ্র পথ তো ছিলই, এবং তাহার প্রমাণও সুপ্রচুর।

তাম্রলিপ্তি - আরকান - ব্রহ্ম - মালয় - যবদ্বীপ - সুবর্ণদ্বীপ পথ

তাম্রলিপ্তি হইতে নিম্ন-ব্রহ্মদেশ বা সুবর্ণভূমির দ্বিতীয় সমুদ্রপথের ইঙ্গিত যে মহাজনক জাতকের গল্পে পাওয়া যাইতেছে, সে-কথা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। এই পথ সম্ভবত ছিল চট্টগ্রাম - আরাকানের সমুদ্রোপকূল বাহিয়া, একাদশ শতকের এবং পরের মধ্যযুগের চট্টগ্রামের সঙ্গে আরাকানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের আনাগোনা যে এই পথেই অনেকটা হইতে তাহা কতকটা অনুমান করা চলে। মধ্যযুগীয় বাংলা - সাহিত্যেও বাংলার সঙ্গে নিম্ন - ব্রহ্মের সামুদ্রিক বাণিজ্যের এবং এই বাণিজ্যপথের সুদূর স্মৃতি ধরিতে পারা কঠিন নয়। সুপারগ জাতক নামে আর একটি জাতকের গল্পেও পূর্ব - ভারতের বণিকদের সুবর্ণভূমিতে যাত্রার কথা আছে। মধ্যযুগে চীন বণিক ও পরিব্রাজকেরা (যেমন, মা - হুয়ান), আরব বণিকেরা এববং পরে পর্তুগীজ বণিকেরা সপ্তগ্রাম ও চেহ্টি - গান বা চট্টগ্রাম হইতে এই সমুদ্রোপকূল বাহিয়াই আরাকান ও নিম্ন ব্রহ্মদেশে যাওযা আসা করিতেন, এমন প্রমাণ একেবারেই দুর্লভ নয়। ইৎসিঙ্ সপ্তম শতকেই বলিতেছেন, হিউয়েন - তা নামে একজন চীন পরিব্রাজক মালায় উপদ্বীপের সমুদ্রকূলবর্তী কেডা (Keddah) হইতে সোজা তাম্রলিপ্তি গিয়াছিলেন। এই পথটির আভাস বোধ হয় খ্রীষ্টীয় চতুর্থ - পঞ্চাশ শতক হইতেই পাইতেছি। মহানাবিক বুদ্ধ গুপ্ত রক্তমৃত্তিকা হইতে সমুদ্রপথে গিয়াছিলেন বাণিজ্য - ব্যাপদেশে। এই রক্তমৃত্তিকা মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি (য়ুযান্ - চোয়াঙের লো টো - মো - চিহ্) বা চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গামাটিও হইতে পারে; শেষেরটি হওয়াই অধিকতর সম্ভব। নব শতকের মাঝামাঝি দেবপালের নালন্দা - লিপিতেও বঙ্গসাগর বাহিয়া এক সমুদ্রপথের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। তখন তাম্প্রলিপ্তি বন্দর অবলুপ্ত; বাংলার আর কোনো সামুদ্রিক বন্দরের উল্লেখও পাইতেছি না। কাজেই, এই পথ সমুদ্রতীর বাহিয়া না কোনাকুনি বঙ্গ সাগর বাহিয়া, উড়িষ্যার কোনো বন্দর হইয়া তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতেছে না।

তাম্রলিপ্তি - পলৌরা - মালায় - সুবর্ণভূমি - পথ

তৃতীয় আর - একটি পথের কথাও বলিতে হয়। এই পথের সর্বপ্রাচীন সংবাদ দিতেছেন ভৌগোলিক ও জ্যোতির্বেত্তা টলেমি। তাম্রলিপ্তি হইতে যাত্রা করিয়া জাহাজগুলি সোজা আসিত উড়িষ্যা দেশের পলৌরা (Paloura) বন্দর, এবং সেখান হইতে কোনাকুনি বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়া যাইত মালয়, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ- উপদ্বীপগুলিতে

* বিশ্বভারতী পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বাংলা ১৩৫৪, ইং ১৯৪৭ হইতে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে পুনর্মুদ্রিত।